পুরাণ-কথা ॥ আঃ খ্রীস্টপূর্ব ১০০০-৩৫০

প্রাচীন বাঙলার প্রাচীনতম অধ্যায় অস্পষ্ট, পুরাণ-কথায় সমাচ্ছন্ন। ইতিহাসের সেই প্রদোষ উষায় কয়েকটি প্রাচীন কোমের নাম মাত্র পাওয়া যাইতেছে ; ইহাদের কাহারও কাহারও কিছু

* অন্যান্য অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়েও এই সব বিচিত্র তথ্যের মূল আমি নির্দেশ করি নাই ; সে-জন্য যে-সব গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য তাহা নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। বিস্তৃত নির্দেশ অন্যান্য অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। এই অধ্যায়ে এমন তথ্য ব্যবহৃত হয় নাই যাহা অন্যান্য অধ্যায়ে অনালোচিত থাকিয়া গিয়াছে।

কিছু কীর্তিকলাপের বিবরণও শোনা যাইতেছে কখনো কখনো। কিন্তু, যে-সব গ্রন্থে এই সব উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে তাহার একটিও এইসব জনপদের পক্ষ হইতে রচিত নয়, প্রত্যেকটিরই উৎস অন্যতর জন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সিন্ধু এবং উত্তর-গাঙ্গেয় প্রদেশের যে-সব জন ও সংস্কৃতি এই সব গ্রন্থের এবং গ্রন্থোক্ত কাহিনীর জনক তাঁহারা পূর্ব-ভারতের আর্যপূর্ব ও অনার্য কোমগুলিকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারেন নাই। ইহাদের ভাষা তাঁহাদের বোধগম্য ছিল না ; ইহাদের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, বসন-ব্যসন তাঁহাদের রুচিকর ছিল না ; ইহাদের প্রতি একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞা তাঁহাদের সকল উক্তি ও বিবরণীতে।

ঋগ্বেদে প্রাচীন বাঙলার একটি কোমেরও উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্ব-ভারতের অনেকগুলি 'দস্যু' কোমের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে পুণ্ড্রকোম একটি। এই সব 'দস্যু' কোমদ্বারাই সমস্ত পূর্ব-ভারত তখন অধ্যুষিত। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও বগধ (মগধ ?) জনদের ভাষা পাখির ভাষার সঙ্গে তুলিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন ; ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, পাখির ভাষা যেমন দুর্বোধ্য বঙ্গ ও মগধ জনদের ভাষাও তেমনই দুর্বোধ্য ছিল আরণ্যক গ্রন্থের ঋষিদের কাছে। এই দুই কোমের লোকদের তাঁহারা মনে করিতেন অনাচারী বা আচারবিরহিত। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আচারঙ্গসূত্রে মহাবীর ও তাঁহার যতি সঙ্গীদের সম্বন্ধে যে গল্প আছে আগে তাহা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতেও দেখা যাইতেছে, পথহীন রাঢ় দেশ তখনও পর্যন্ত (আনুমানিক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) এক রূঢ় বর্বর কোমদ্বারা অধ্যুষিত এবং বজ্জ ভূমির (উত্তর-রাঢ়ের ?) ভোজ্য প্রাচীন বিহারবাসী এই সব যতিদের কাছে অরুচিকর। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সমুদ্রতীরবাসী বাঙলার লোকেদের বলা হইয়াছে 'ম্লেচ্ছ' ; ভাগবত পুরাণে সুহ্মদের বলা হইয়াছে 'পাপ' কোম (হূণ, কিরাত, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, যবন, খস, ইহারাও 'পাপ' কোম)। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আরট্ট (বর্তমান পঞ্জাব), সৌবীর (বর্তমান সিন্ধু এবং পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কলিঙ্গ (বর্তমান ওড়িষ্যা ও অন্ধ্র), বঙ্গ এবং পুণ্ড্র জন এবং জনপদগুলিকে একেবারে আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতি-বহির্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইসব জনপদে যাঁহারা প্রবাস যাপন করিতে যাইতেন ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল জনপদের লোকদের ভাষাকে বলা হইয়াছে 'অসুর ভাষা'। ঐতিহাসিক কালে (খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের আগে) প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে অসুরান্ত ঔপধিক রাজাদের নাম পাওয়া যাইতেছে। এই সব বিচিত্র উল্লেখ হইতে স্পষ্টতই বুঝা যায়, ইহারা এমন একটি কালের স্মৃতি ঐতিহ্য বহন করিতেছেন যে-কালে আর্য-ভাষাভাষী এবং আর্য-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর ও মধ্য-ভারতের লোকেরা পূর্ব-ভারতের বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, সে-কালে এই সব কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবহার অন্যতর। জনতত্ত্বের দিক হইতেও যে এই সব লোকেরা অন্যতর জনের লোক ছিলেন, তাহার ইঙ্গিত তো আমরা আগেই পাইয়াছি,; পুরাণ-কাহিনীর মধ্যেও তাহার কিছু ইঙ্গিত আছে, পরে তাহা উল্লেখ করিতেছি। এই অন্যতর জন, অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষার লোকদের সেই জন্যই বিজেতা-জাতিসুলভ দর্পিত উন্নাসিকতায় বলা হইয়াছে দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর ইত্যাদি।

কিন্তু এই দর্পিত উন্নাসিকতা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে আর্য-ভাষাভাষী আর্য-সংস্কৃতির বাহকেরা ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছেন—ব্যক্তিগত বা কৌমগত খেয়ালবশে নয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মের তাড়নায়, উর্বর শস্যক্ষেত্রের সন্ধানে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নদীতীরশায়ী বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমির সন্ধানে এবং আদিমতর কোমবৃন্দের উপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায়। এই বিস্তৃতির মূলে ছিল আর্য-ভাষাভাষী ও আর্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের উন্নততর কৃষিব্যবস্থা, উন্নততর যন্ত্রাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রামায়ণ-মহাভারতে এই অনুমানের কিছু কিছু যুক্তিও আছে। তাহা ছাড়া, মননশক্তি ও অভিজ্ঞতাতেও বোধ হয় ইহারা উন্নততর স্তরের লোক ছিলেন। গোড়ার দিকে এইসব বিভিন্ন জন, ভাষা ও সংস্কৃতির পরস্পর পরিচয়ের বিরোধের মধ্য

দিয়াই হইয়াছিল। যাহাই হউক, আপাতত বাঙলাদেশে আর্যভাষীদের ক্রমবিস্তারের, পরস্পর পরিচয় ও যোগাযোগের এবং বিরোধ ও সমন্বয়ের আরম্ভিক দুই চারিটি সাক্ষ্যসূত্রের সন্ধান লওয়া যাইতে পারে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিব কোমের লোকেরা ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পঞ্চাশটি পুত্রের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ; তাঁহারা যে আর্যভূমির প্রত্যন্ত দেশে বাস করিতেন তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঠিক এই ধরনের একটি গল্প আছে মহাভারতে এবং বায়ু, মৎস্য ইত্যাদি পুরাণে। এই গল্পে অসুর বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্র উৎপাদনের কথা বর্ণিত আছে ; এই পাঁচ পুত্রের নাম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম ইঁহাদের নাম হইতেই পাঁচ পাঁচটি জনপদের নামের উদ্ভব। রামায়ণে দেখিতেছি, বঙ্গদেশের লোকেরা অযোধ্যাধিপের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল এবং বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী এবং কোশল কোমবর্গ অযোধ্যা-রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রঘু কর্তৃক সুহ্ম এবং বঙ্গ-বিজয়ের প্রতিধ্বনি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যেও আছে। মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও প্রাচীন বাঙলার অনেকগুলি কোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণ সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গদের পরাজিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। পৌণ্ড্রক-বাসুদেব নামে পৌণ্ড্রদের এক রাজা বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদের এক রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করিয়া মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বাসুদেবকে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ও জরাসন্ধের সমবেত সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণ-বাসুদেব শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছিলেন। ভীমও এক পৌণ্ড্রাধিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাহার পর একে একে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত কর্বট ও সুহ্মের রাজাদের ও সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছদের পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। এই সব কোমদের মধ্যে পুণ্ড্র ও বঙ্গ কোমই সবচেয়ে পরাক্রান্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের কীর্তিকলাপ নগণ্য নয় ; জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁহার মৈত্রীবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডব-ভ্রাতাদের পক্ষে শঙ্কা ও চিন্তার কারণ হইয়াছিল। এক বঙ্গরাজ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরবপক্ষে দুর্যোধনের সহায়ক হইয়াছিলেন ; ভীষ্মপর্বে দুর্যোধন- ঘটোৎকচ যুদ্ধে এই বঙ্গরাজ যথেষ্ট বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

আর্য যোগাযোগ

সদ্যোক্ত পুরাণকথাগুলির ঐতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ করা যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে পুণ্ড্র, শবর ইত্যাদি কোমদের এবং পুরাণ-মহাভারতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম কোমগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-আখ্যান বর্ণিত আছে তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই সব আখ্যান এক সুদূর অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। সে-কালে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকরা পূর্ব-প্রত্যন্ত এই সব দেশগুলিতে কেবল প্রথম পদক্ষেপ করিতেছেন মাত্র। কোনও বিজয় অভিযান নয় ; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দুরন্ত, দুর্গম পথকামী তাঁহারাই শুধু আসিতেছেন দুঃসাহসী প্রথম পথিকৃতের মতো, যেমন বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পঞ্চাশটি সন্তান। তাহার পরই আসিতেছেন প্রচারকের দল—একটি দু'টি করিয়া, যেমন বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমস। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বড় বিচিত্র ; প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলনের যত কিছু বাধা—জাতি, সমাজ, আচার, ধর্ম, সকল কিছুর বাধা সবলে অতিক্রম করে। এই সব দুঃসাহসী পথিকৃৎ ও প্রচারক যখন দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ ও অসুর কোমদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন পরস্পরের সংযোগ ঘটিতে দেরী হইল না, প্রাকৃতিক নিয়মেই সকল বাধা ক্রমশ ঘুচিয়া যাইতে লাগিল, এবং বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসও প্রকৃতির নিয়ম এড়াইতে পারিলেন না ; কিন্তু, প্রাকৃতিক

নিয়মও সক্রিয় হইল বিরোধের মধ্য দিয়াই। কর্ণ, ভীম ও কৃষ্ণের যুদ্ধকাহিনী, পৌণ্ড্রক-বাসুদেব কর্তৃক জরাসন্ধের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন, বঙ্গরাজ ও দুর্যোধনের মৈত্রীবন্ধন, আচারঙ্গসূত্রের গল্পে রাঢ়বাসীদের দ্বারা মহাবীর ও তাঁহার যতি সঙ্গীতের পশ্চাতে কুকুর লেলাইয়া দেওয়া, ঢিল ছোঁড়া, ইত্যাদি গল্পের ভিতর সেই বিরোধের স্মৃতি সুস্পষ্ট। এই সব কোমের লোকেরা সহজে বিনা যুদ্ধে বিনা প্রতিরোধে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকদের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে রাজী হ'ন নাই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সমাজ-প্রকৃতির নিয়মই জয়ী হইল; উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা, উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রবিদ্যা, এবং উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতি জয়ী হইল।

আর্যীকরণের সূত্রপাত

প্রাথমিক পরাভব ও যোগাযোগের পর এই সব পূর্বদেশীয় কোমগুলি ক্রমশ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি এবং আর্য সমাজ-ব্যবস্থার একপ্রান্তে স্থানলাভ করিতে আরম্ভ করিল। এই স্বীকৃতি ও স্থানলাভ একদিনে ঘটে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একদিকে এই সংঘাত ও বিরোধ এবং অন্যদিকে এই স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি চলিয়াছিল, কখনও ধীর শান্ত, কখনও দ্রুত কঠোর প্রবাহে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটিয়াছিল আগে; সংস্কৃতির পরাভব ঘটিয়াছে অনেক পরে। বস্তুত, এই সব কোমের ধর্ম ও আচারগত, ধ্যান ও বিশ্বাসগত পরাভব আজও সম্পূর্ণ হয় নাই; সামগ্রিক আর্যীকরণের ক্রিয়া আজও চলিতেছে, ধীরে ধীরে, আপাতদৃষ্টির অগোচরে। যাহাই হউক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেও দেখিতেছি, রাঢ়দেশে আর্য জৈনধর্ম প্রচারকেরা বাধা ও বিরোধের সম্মুখীন হইতেছেন। স্থানে স্থানে এই বিরোধ তখনও চলিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে, সঙ্গে সঙ্গে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি লাভও ঘটিতেছে। রামায়ণ-কাব্যে দেখিয়াছি, প্রাচীন বঙ্গের রাজন্যরা অযোধ্যার রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। মানবধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্তের সীমা দেওয়া হইতেছে পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলাদেশের অন্তত কিয়দংশও আর্যাবর্তের অন্তর্গত, এই যেন ইঙ্গিত। কিন্তু মনুই আবার পুণ্ড্রকোমের লোকদের বলিতেছেন ব্রাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয় এবং তাঁহাদের পংক্তিভুক্ত করিতেছেন দ্রাবিড়, শক, চীনদের সঙ্গে। মহাভারতের সভাপর্বে কিন্তু বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে; জৈন প্রজ্ঞাপনা-গ্রন্থেও বঙ্গ এবং রাঢ় কোম দুইটিকে আর্য কোম বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহাভারতেই দেখিতেছি, প্রাচীন বাঙলার কোনও কোনও স্থান তীর্থ বলিয়াও স্বীকৃত ও পরিগণিত হইতেছে, যেমন পুণ্ড্র ভূমিতে করতোয়াতীর, সুহ্মদেশে ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম। অর্থাৎ, বাঙলা এবং বাঙালীর আর্যীকরণ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, ইহাই এই সব পুরাণ-কথার ইঙ্গিত।

প্রাচীন সিংহলী পালি-গ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ-কথিত সিংহবাহু ও তৎপুত্র বিজয়সিংহের লঙ্কাবিজয়-কাহিনী সুবিদিত। আগেই বলিয়াছি, এই কাহিনীর লাল দেশ প্রাচীন বাঙলার রাঢ় হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বঙ্গ ও রাঢ়াধিপ সিংহবাহুর পুত্র পিতার ক্রোধের হেতু হইয়া রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন। তিনি প্রথম সমুদ্রপথে ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতীরের সোপারা (সুপ্পারক=শূর্পারক) বন্দরে গিয়া বসতি আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার সঙ্গীদের অত্যাচারে সোপারার লোকেরা উত্যক্ত হইয়া উঠে। বিজয় সেই দেশও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অবশেষে তম্বপণ্ণি দেশের (=তাম্রপর্ণী=বর্তমান লঙ্কা বা সিংহল) লঙ্কা নামক স্থানে চলিয়া যান এবং সেখানে এক রাজ্য ও রাজবংশ স্থাপন করেন। সিংহলী ঐতিহ্যের মতে এই ঘটনার তারিখ এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের তারিখ (অর্থাৎ ৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্ব) একই। মোটামুটি ষষ্ঠ-পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্ব শতকে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাম্রলিপ্তি-তাম্রপর্ণী বা সিংহল-ভরুকচ্ছ-সুপ্পারকের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ একেবারে

অপ্রতুল নয়। সমুদ্দ-বণিজ-জাতক, শঙ্খ-জাতক, মহাজনক-জাতক ইত্যাদি গল্পে তাম্রলিপ্তি-সিংহলের বাণিজ্যের কথা বারবার উল্লিখিত আছে। এ-সব গল্পে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের বাণিজ্যিক চিত্র প্রতিফলিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বিজয়সিংহ এই ধরনের কোনও প্রাচীন বাণিজ্য-নায়ক হইয়া থাকিবেন। পিতৃরোষে নির্বাসিত হইয়া সুপ্পারকে-সিংহলে নিজ ভাগ্যান্বেষণ করিতে গিয়া হয়তো রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন।

সামাজিক ইঙ্গিত

সদ্যোক্ত জাতকের গল্প ও পালি মহানিদ্দেস-গ্রন্থের ইঙ্গিত, মহাভারতে বঙ্গ ও পুণ্ড্র-রাজগণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট হস্তী, মুক্তা এবং মূল্যবান বস্ত্রাভরণ উপঢৌকন আনয়ন, সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক সুবর্ণ উপহার দান, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বাঙলাদেশজাত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের বর্ণনা, মিলিন্দপঞ্হ-গ্রন্থে বাঙলার সমৃদ্ধ স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিবরণ, পেরিপ্লাস-গ্রন্থে, ষ্ট্রাবো ও প্লিনির বিবরণীতে বাঙলার বিচিত্র মূল্যবান বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভারের বিবরণ প্রভৃতি পড়িলে মনে হয়, খুব প্রাচীন কাল হইতেই বাঙলাদেশ কতকগুলি কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যে এবং খনিজদ্রব্যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল ; বাঙলার হস্তীও উত্তর-ভারতীয় রাজন্যবর্গের লোভনীয় ছিল। এই সব সমৃদ্ধির লোভেই হয়তো উত্তর-ভারতের ক্ষমতাবান্ রাজা ও রাজবংশ পূর্ব-ভারতের এই জনপদগুলির দিকে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর-গাঙ্গেয়-ভূমির আর্যভাষা, আর্যসমাজ ও সংস্কৃতির ধীরে ধীরে বাঙলায় বিস্তৃতি লাভ করে।

অঙ্গ (উত্তর-বিহার)-পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ-কলিঙ্গ কোমের লোকেরা, অন্ধ্র-পুণ্ড্র- শবর-পুলিন্দ-মুতিব জনেরা যে সুপ্রাচীন বাঙলায় মোটামুটি একই নরগোষ্ঠীর লোক ছিলেন, এ-তথ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষি এবং মহাভারতকারের বোধ হয় অজ্ঞাত ছিল না আগে এক অধ্যায়ে দেখিয়াছি, ইঁহারা বোধহয় ছিলেন অস্ট্রিক-ভাষী আদি অস্ট্রলয়েড নরগোষ্ঠীর লোক, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের ভাষায় অসুর'। উপরোক্ত বিচিত্র উল্লেখ হইতেই দেখা যায়, সেই সুপ্রাচীন কালেই ইঁহারা কোমবদ্ধ হইয়াছেন এবং এক একটি জনপদকে আশ্রয় করিয়া এক একটি বৃহত্তর কৌমসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এক কৌমসমাজের সঙ্গে অন্য কৌমসমাজে পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে, কখনো কখনো আবার পরস্পরের মৈত্রীবন্ধনও দেখা যাইতেছে। মহাভারতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারতযুদ্ধ গল্পের তিলমাত্র ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিলেও ইহাও মানিয়া লইতে হয় যে, মাঝে মাঝে এই সব কোম ঐক্যবদ্ধ হইয়া প্রতিবেশী জনপদরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে মিলিত হইত এবং উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিত। কৌমবদ্ধ সমাজ যখন ছিল, সেই সমাজের একটা শাসন-শৃঙ্খলাও নিশ্চয়ই ছিল। তাহা না হইলে প্রাচীনতম বাঙলার যে সমৃদ্ধ বাণিজ্য-বিবরণের কথা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-পুরাণ গ্রন্থাদিতে পাঠ করা যায় এবং যাহার কয়েকটি সূত্র ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমৃদ্ধ বাণিজ্য সম্ভব হইত না। কিন্তু এই শাসনশৃঙ্খলার স্বরূপ কী ছিল বলা কঠিন। গোড়ার দিকে এই শাসন-ব্যবস্থা বোধ হয় কৌমতান্ত্রিক, কিন্তু, মহাভারতে ও সিংহলী বিবরণীতে যে-যুগের কথা পাইতেছি সেই যুগে কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, প্রায় সর্বত্রই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে-ভাবে বহুবচনে কোমগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে (যথা, পুণ্ড্রাঃ, বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, সুহ্মাঃ ইত্যাদি) তাহাতে মনে হয়, রাজতন্ত্র সুপ্রচলিত হইবার পরও বহুদিন পর্যন্ত ঐতিহ্য ও লোকস্মৃতিতে কৌমতন্ত্রের স্মৃতি জাগরূক শুধু নয়, তাহার কিছু কিছু অভ্যাস এবং ব্যবস্থাও বোধ হয় প্রচলিত ছিল, বিশেষত শাসনকেন্দ্র হইতে দূরে গ্রামা লোকালয়গুলিতে। প্রাচীন বাঙলায় রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হইতে হইতে মৌর্য-যুগের খুব আগে হইয়াছিল বলিয়া যেন মনে হয় না।